Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 110 - 119
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 110 - 119
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষা আন্দোলনের দর্পণে শামসুর রহমানের কবিতা

সুজিত প্রামানিক
Email ID : sujit1995pramanik@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Liberation war, Bengali literature, Bangladesh, Language movement, Rupali snan, Atmahatyar age, optimistic, memorable.

Abstract

Poet Shamsur Rahman bearer of the message of the era in one fire the second half of the 20th century. He has become the greatest poet of Modern Bengali poetry in the triveni sangam of consciousness of history, consciousness of time, consciousness of life. The two trends that left on overall impression on the creation of literature in contemporary Bangladesh are- 1. Language Movement of 1952, 2. Liberation war of 1971. Poet Shamsur Rahman strongly embraced these two ranges. The watermark that remains is in the narration of each poem. Another dimension of rebellion can be found in his poetry. Shamsur Rahman's poem gives us a vivid picture of how the flow of time has gripped Bangladesh and turned it upside down from all sides.

I will discuss his selected poems in this discussion keeping in mind the dark period of the second half of the 20th century in Bangladesh. Among his notable poems are 'Bangladesh swopno dyakhe', 'Rupali snan', 'Atmahotyar age', 'February 1969', 'A lash amra Rakhbo kothai' etc which carry the gloom and wearings of the age even today. The focous of our discussion will be on Shamsur Rahman's selected poems depicting the narrative of turbulent times.

Discussion

পূর্ব পাকিস্তানে মূলত ছিল বাংলা ভাষার কথা বলার চল। সেখানে বাঙালির মাতৃভাষাকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল, ফলে বাংলা ভাষা স্বীকৃতিতে বাংলাদেশের শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক নির্বিশেষে ঢাকা কেন্দ্রে বাংলা ভাষার পক্ষে ভাষা আন্দোলন করলেন ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি। এই ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই মুক্তিযুদ্ধেদের বীজ বপন হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের হয়ে নেতৃত্বে দিলেন বঙ্গসন্তান তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, ৭ই মার্চ রেসকোর্সের জনসভায় জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণ ছিল—

> “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
> এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”[১]

স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের বিশ শতকের ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পট প্রেক্ষিতে কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াসের সাহিত্য জগতে আবির্ভাব হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রান্তিক, খেটে খাওয়া, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি, বেঁচে থাকার লড়াই, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ সমস্ত তাঁর সাহিত্যে তিনি তুলে ধরেছেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ইতিহাসের কালগত পরিসরে এক উল্লেখযোগ্য সময়, যে সময়ের দেশ কালকে জানতে গেলে ইতিহাসের পাশাপাশি অবশ্যই আমাদের ইলিয়াসের সাহিত্যকে পাঠ করা জরুরী। মূলত ৬৯ এর পটভূমিকে ঘিরেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তার 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি রচনা করেন। ৬৯ গণজাগরণ ঘটেছিল সামগ্রিকভাবে মুক্তির দাবি নিয়ে, সেই দাবি পূর্ববঙ্গের গ্রাম শহর নির্বিশেষে সকল মানুষের দাবি ছিল। এই উপন্যাসে সেকথা স্পষ্ট জানিয়েছেন ইলিয়াস—

> "দক্ষিণ দিকে মুখ করে কয়েকজন স্লোগান দেয় 'বাংলার মজদুর এক হও' ছয় দফা ছয় দফা – 'মানতে হবে মানতে হবে', 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' - মানি না মানি না; 'শেখ মুজিবর শেখ মুজিবর' মুক্তি চাই মুক্তি।"[২]

শেখ মুজিবুর রহমানের 'মুক্তির সংগ্রাম' এই ভাষণই যেন পূর্ববঙ্গের মানুষদের গর্জে ওঠার ইন্ধন জুগিয়ে ছিল, শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে মুক্তিযুদ্ধের ডাক। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান পূর্ববাংলার মানুষদের শোষণ থেকে সুস্থিতি ও পরিত্রাণের আশায় ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোরে ছয় দফা দাবি প্রস্তাব দেন, কিন্তু এই ছয় দফা দাবিকে তৎকালীন শাসকবর্গ রাষ্ট্রদ্রোহিতার তকমা লাগিয়ে ১৯৬৬ সালের ১৯শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে যশোর থেকে গ্রেফতার করে। আদতে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে ঘা লাগায় এমন পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে মূলত কেউই একজন বাঙালির এমন স্পর্ধিত তর্জনী সহ্য করতে চায়নি। তবে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের রক্তাক্ত দিনগুলির মূলে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের রক্ষা করা। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছিলেন রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে ছাত্র, যুবক, শিক্ষক প্রমুখ। তবে বলাবাহুল্য সমকালে তখন বিশ্বের অন্যপ্রান্তে ১৯৬৫ থেকে ১৯৯৬৮ সাল পর্যন্ত নাগাদ ভিয়েতনাম, নিউইয়র্ক, থেকে শুরু করে ফ্রান্স, ল্যাটিন, আমেরিকায় চলছিল ছাত্র আন্দোলন। অ্যাসিড রেইনিং এর থেকে শুরু করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখানকার মানুষদের গায়ে। সেই জ্বলন্ত দগ্ধ শরীর নিয়েও পুড়তে পুড়তে তারা শুধুমাত্র হাতে তৈরি বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করেছিল আমেরিকা সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে। ভিয়েতনামের এই যুদ্ধ ছিল বাংলাদেশের বাঙালি যুবকদের তথা ছাত্রদের কাছে একটা বড় ইন্সপিরেশন। এই ইন্সপিরেশন থেকেই নিজের রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দুর্মর ইচ্ছার তাগিদে ১৯৬৯ ও ১৯৭১ এর গনভ্যুত্থানের ফলে তারা একে একে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযোদ্ধা থেকে শুরু করে ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, শিশু, ঘরের মেয়ে সহ সাধারণ মানুষের উপর চলে ছিল তুমুল অত্যাচার। নির্বিচারে গুলি চলেছিল ছাত্রাবাস থেকে শহরের রাস্তায়, বস্তির পরে বস্তি উজাড় হয়েছিল। তথাকথিত পাকিস্তানি সেনারা নির্বিচারে চালিয়েছিল গণহত্যা, ধর্ষণ। আদতে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ হিন্দুদের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালিয়েছিল।

এরকমই ভয়াবহ অত্যাচারে ধুকছিল তৎকালীন বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশ। পূর্ব পাকিস্তানের তখনও কোন অস্ত্র নেই, অর্থ নেই, পর্যাপ্ত সেনা নেই, শুধুই রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদারদের বুটের বীভৎস আওয়াজ, রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের ছোড়া কামান, গোলা, ট্যাঙ্করের তীব্র হাতছানি। মুক্তিযুদ্ধের সে সময়ে যে বা যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের সে সময় সামাজিক অবস্থান যে পর্যায়ে ছিল তা উত্থাপন করতে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের নাটোরের কুজাইল গ্রামের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজের স্ত্রী ফজিলা আজিজকে তার লেখা একটি চিঠির অনুসঙ্গ আনা যেতে পারে। সেখানে মুক্তিকামী যোদ্ধা আব্দুল আজিজ লিখেছিলেন-

> "রাস্তার ধারের মানুষের জীবনে নিরাপত্তা নেই। রোজ গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ছাড়াও যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দুই একদিন পর আধমরা অবস্থা রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে।

> ...বাড়িতে আগুন আর গুলি করে মানুষ মারার তো কথাই নেই তা ছাড়া লুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি সব সময় হচ্ছে।"[৩]

একইভাবে আরেকটি চিঠির অনুষঙ্গ না দিলেই নয় এখানে যদিও চিঠির লেখকের পরিচয় জানা যায়নি, চিঠিটি মুক্তিযুদ্ধের সময় ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে 'জাগ্রত বাংলায়' প্রকাশিত হয়। সে সময় বাংলার মায়েরাও নিজের ছেলেকে স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিল। বুকে পাথর চাপা দিয়ে একই সঙ্গে সেখানকার লিখিত বয়ান সে সময়ে যে সাক্ষ্য দেয় তা রোমহর্ষক—

> "যুদ্ধনীতি ওদের নেই, তাই বাংলার নিরীহ অস্ত্রহীন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষকবৃদ্ধ, শিশু ও নারীর উপর হত্যাকাণ্ডের মই চালাচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ড ভিয়েতনামের একাধারে মাইলারের হত্যাকাণ্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে। ওরা পশু...।"[৪]

তখন মুক্তিযোদ্ধাদের নিভৃত আশ্রয়স্থল পশ্চিমবঙ্গ বর্ডার লাগোয়া অঞ্চলে বিশেষত মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নিয়েছিল নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। একদিকে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চ লাইটের ধ্বংসলীলা যজ্ঞে একের পর এক বাঙালি জাতিকে আহুতি দেওয়া হচ্ছিল, অন্যদিকে সমকালে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবসহ ১৫জন নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। পূর্ব পাকিস্তানের এই ভয়াবহতা দেখে তিনি ভারতীয় সেনাকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনা দিয়ে সাহায্য করতে, কিন্তু তখন আসন্ন বর্ষাকাল কিছুকালের মধ্যেই বাংলাদেশের নদীগুলি জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় ফলে যুদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ভারতীয় সেনারা সকলে মিলে স্থির করে শরণার্থী সহ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া হবে ও তাদের যুদ্ধের কৌশল শিখিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হবে। তাই সেই সময় ইন্দিরা গান্ধীর একক সিদ্ধান্তে ভারতীয় বায়ু সেনা ও জলসেনা রাতের অন্ধকারে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাদের উপর আক্রমণ করে ও তাদের পরাজিত করে তাদের দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি করে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করেন। সে সময় ইন্দিরা গান্ধী বিপুল অর্থ দেয় বাংলাদেশের হাল ফেরাতে। এই সময় স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন শেখ মুজিবুর রহমান পরে তিনি রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়ে যাক এটা অনেকেই মেনে নিতে চাইতেন না, তার ওপর একজন বাঙালি মন্ত্রিত্বের আসনে বসে দেশের শাসনভার গ্রহণ করুক এই ঘটনা সহজে মেনে নিতে না পেরে চক্রান্ত করে ফারুক রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নং এর বাসভবনে নির্মম হত্যা লীলা চালায়, হত্যা করা হয় জাতির পিতা মজিবুর রহমানকে, সেখানে বাদ যায়নি তার শিশু পুত্র রাসেল, বাদ যায়নি তার অন্তঃসত্তা পুত্রবধূটিও। দেশের বাইরে থাকার সুবাদে বেঁচে যান মুজিবুরের দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। এই সময়কালের অভিঘাতে উঠে আসে শামসুরের কবিতা গুলি, যা বহন করে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশের রক্তাক্ত দিনের স্মারক চিহ্ন।

শামসুর রহমান একালের আধুনিক কবি। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের এই কবি তাঁর কবিতাইয় মানুষের বাঁচার সংগ্রামকে এক অদ্ভুত জ্বলন্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর কলমে তুলে ধরে অক্ষরের আয়তন দিয়েছেন। কবি শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের কবিতা রচনা করেননি, তাঁর কবিতা রচনার মূলে রয়েছে তার গভীর মনীষা ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি। যা তাঁকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে দুই বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী করে তুলেছে। শামসুর রহমানের অবিস্মরণীয় কবিতা 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' কবিতাটি তাঁর 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। এই কবিতায় তিনি সমকালীন সংকটকে তাঁর নিজস্ব জিজ্ঞাসা দিয়ে আরম্ভ করে অন্তরেখায় উপনীত হয়েছেন এক আশাবাদী চৈতন্যে-

> "বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি, নিথর বিশাল,
> মাটি ফুঁড়ে জেগে ওঠে গভীর রাত্রিরে!
> মুখে শতাব্দীর গাঢ় বিশদ শ্যাওলা আর ভীষণ ফাটল,
> যেন বেদনার রেখা।

ব্রোঞ্জের অদ্ভুত চক্ষুদ্বয় খুব স্থির
চেয়ে থাকে অন্ধকারে...।"[৫]

কবিতার প্রথম স্তবকেই কবি একটি ব্রোঞ্জের মূর্তির কথা বলেছেন সঙ্গে ব্রোঞ্জের মূর্তি জেগে ওঠার প্রত্যাশাও তিনি করেছেন। যে সময় কবিতাটি রচিত তা দুর্নিবার বিপর্যয়ের কাল তবু তার মধ্যেও শামসুর রহমানের ধ্রুবদর্শী দর্শন যাবতীয় সামাজিক দুর্বিপাককে অগ্রাহ্য করেছে এবং তিনি বলেছেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেতে চাইছে সে স্বপ্ন দেখছে এক ব্রোঞ্জের মূর্তির। যে এক নতুন বাংলাদেশ আনবে। সমকালীন বিধ্বস্ততায় এত প্রাণের বিনিময়ে সংগ্রামীরা যে সংগ্রাম দিচ্ছে তা ফেটে বার হচ্ছে ব্রোঞ্জের মূর্তির মধ্যে দিয়ে। কবির প্রত্যাশিত ব্রোঞ্জের মূর্তির মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু বলতে চাইলেও বলতে পারেননি, কারণ সে অদ্যান্ত একা-

"বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে বনপোড়া একটি হরিণী
ছোটে দিগ্বিদিক, তীব্র তৃষ্ণায় কাতর; জলাশয়ে মুখ রেখে
মরুর দুরন্ত দাহ মেখে নেয় বুকে এবং আপনকার
মাংস আর হাড়ের ভেতরে
সে ঘুমায় নিরিবিলি...।"[৬]

এইরকম পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ জেগে ওঠার তথা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, যে সময় গলিত পচিত। এখানে সাপ সময়ের দ্যোতক। এই কালের ছোবলকেই অনেকে মুদিরা ভেবে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে নদীমাতৃক দেশ সেখানে প্রত্যহ জাহাজের ভিড়—

"বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে- মধ্যরাত্রির শহরে একা
সুনীল জাহাজ
সহজে প্রবেশ করে, নাবিকেরা গাঙচিল হ'য়ে
কলোনির, বাণিজ্যিক এলাকার ছাদে ছাদে ওড়ে।"[৭]

সেই জাহাজে করে কলোনিতে এসে অগণিত লাশ, সেই জাহাজ কলোনির বুকে নির্মমভাবে আঘাত হানে, যে জাহাজ কলোনিতে আসে লুট করতে। চারিদিকে পল্লবের স্তূপ এর মতো মৃত মানুষ ছড়িয়ে থাকে; তাদের কয়েকটি সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয় রাশি রাশি তবলাকে। চতুর্থ স্তবকে কবির বর্ণনায় ধরা পড়েছে নারী ও শিশুর ছবি, যে ছবি কোন সুখকর মাতৃত্বের ছবি নয়। কলোনি আমাদের কিছু দিক না দিক মৃত্যুর দাপট সে দেখিয়ে দিয়েছে, সেখানে কিবা শিশু কিবা জননী কিবা প্রেমিক-

"বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে মৃত শিশু মেঘ ভাসমান ক্ষমাহীন,
কার্পেটের তলা থেকে, জানালার পুরু পর্দা থেকে,
টেলিগ্রাম আর কিছু পুরনো চিঠির তাড়া থেকে
এবং মাছের পেট থেকে নারী আর শিশু আসে ভেসে ভেসে,
মেহেদী পাতার ভিড় থেকে, বেলুনের ঝাঁক থেকে
নারী আর শিশু ভেসে আসে।"[৮]

মুসলিম ধর্মে মেহেদির রং শুভর প্রতীক, বেলুন এখানে শিশুর আনন্দের প্রতীক। হয়তো সেই মেহেন্দির রঙে কত প্রেম মিশে থাকার কথা, হয়তো কতো শিশুর প্রাণ খোলা আনন্দ ছিল সেই বেলুনের মধ্যে কিন্তু আজ আর কেউ বেঁচে নেই-

"ক্লাউনের টুপি সবুজ ঘোড়ার পায়ে পায়ে ঘোরে,
ক্লাউন কফিনে ব'সে পিট পিট চেয়ে থাকে ভীষণ একাকী।
বৃষ্টি পড়ে রঙ করা গালে তার, বৃষ্টি পড়ে মৃত্যুর পাহাড়ে।"[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 110 - 119
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই পরিসরে বসে থাকে মৃত মানুষের শেষ ঠিকানায় ক্লাউন। তার রঙের মুখ বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় অর্থাৎ তার মুখের হাসি যেন বৃষ্টি ধুয়ে দেয়। এই অসামান্য উপমায় তিনি সংকটের পরিস্থিতিকে শিল্পের কথা দিয়ে অতিক্রম করবার বোধ সঞ্চারিত করেছেন তাঁর কবিতায়। যা কবিতাটি কে মুহূর্তের সমকালীনতা থেকে উত্তীর্ণ করেছে স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ যাত্রী চিরকালীনতায়। তাই কবির প্রগার আশা বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে একদিন ঠিক অরাজকতার প্রহর কেটে যাবে, স্বাধীনতার স্বপ্ন সত্যি হবে।

'রূপালি স্নান' কবিতায় আবেগের সংরাগকে ধারণ করে, প্রকাশের রীতিতে তাকে প্রচ্ছন্ন রেখে কবিতাকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন শামসুর রহমান। রূপালি স্নান কবিতাটি কবি শামসুর রহমানের প্রথম পর্বের কবিতা। ইতিপূর্বে বিশ শতকের প্রথমার্ধে তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'হে মহাজীবন' কবিতায় লিখেছিলেন -

> "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
> পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"[১০]

পক্ষান্তরে এই রুটির প্রসঙ্গ উঠে এলো দেশভাগ পরবর্তী সময়কালে ওপার বাংলার এক অস্থির পরিবেশে শামসুর রহমানের হাত ধরে। তিনি লিখলেন-

> "শুধু দু টুকরো শুকনো রুটির নিরিবিলি ভোজ
> অথবা প্রখর ধু ধু পিপাসার আঁজলা ভরানো পানীয়ের খোঁজ
> শান্ত সোনালি আলপনাময় অপরাহ্ণের কাছে এসে রোজ
> চাইনি তো আমি। দৈনন্দিন পৃথিবীর পথে চাইনি শুধুই
> শুকনো রুটির টক স্বাদ আর তৃষ্ণার জল।"[১১]

ইতিপূর্বে ১৯৪৭ পূর্ববর্তী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যেখানে ক্ষুধার তীব্রতা অনুভব করে পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে পোড়া রুটি ভেবে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন, সেখানে পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকে বাংলাদেশের চরম পরিস্থিতিতে কবি শামসুর রহমান তাঁর কবিতার অন্তরবয়ানে সঙ্গতিবিহীন বিষয়কে বিপরীত ভাষ্য দিলেন। আদতে এ কবিতা শামসুরের চেনা কবিতার মতো নয়; কবিতাটি আপাতত শ্রুতিতে কবি জীবনানন্দের কবিতার স্বর খানিকটা চিত্রকল্পের পরিসরে উঠে আসে। কবি শামসুরের চেনা কবিতার শ্রুতি, ধ্বনিসাম্য এ কবিতাই নেই। এই কবিতার সবকিছুর মধ্যেই জড়িয়ে কবির আমিত্ব সত্তা। কবির এই আমিত্বসত্তায় তাঁর কবিতার অন্তরবয়ানকে কল্পনা তত্ত্বের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় কোন সঙ্গতিহীন বিষয়কে এবং কার্যকারণ পরম্পরায় তা হয়ে ওঠে বিপরীত ভাষ্য।

কবিতায় উল্লেখিত দু'টুকরো রুটি, প্রগাঢ় মদ, রক্ত, মাংসকে প্রতিকারিত করে যা ঈশ্বর প্রদত্ত। খাদ্য পানীয় আমাদের সর্বস্ব হলেও এই খাদ্য পানীয়ের বাইরে সব মানুষের নিজস্ব চাহিদা থাকে। দিনের শেষে আমরা সেই প্রকৃতিকে লালন করি, শামসুর রহমানের কবিতায় মনে করায় প্রকৃতির নিবিড় চিত্রনকে, তার সঙ্গে মনে করায় মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদাকে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ত্রিশের বিবর্ণ যুগে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ দাশ তাঁর স্বদেশ প্রেমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রকৃতি চেতনার মধ্যে দিয়ে—

> "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
> খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকার জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
> চেয়ে দেখি ছাতার মতো বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
> ভোরের দোয়েল পাখি চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ;
> জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বত্থের করে আছে চুপ;"[১২]

কবি প্রকৃতির অবারিত ঘাসের শয্যায় অনিবার্য পরিণামে বিশ্বাসী, আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করি শরীরের বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে তাই পরিণতির অন্তিম পর্বে আমরা প্রকৃতির রেনু রেনু হয়ে মিশি অথবা ছাই হয়ে, কখনো কফিনে। যার সৃষ্টি আছে তার লয়ও আছে। পঞ্চভূতে আমরা বিলীন হয়েযায়, তাই সকলকে যেতে হয় ঘাসে শয্যায়-

> "ভাবিনি শুধুই পৃথিবীর বহু জলে রেখা এঁকে
> চোখের অতল হ্রদের আভায় ধুপছাড়া দেখে
> গোধূলির রঙে একদিন শেষে
> খুঁজে নিতে হবে ঘাসের শয্যা। ছন্দে ও মিলে কথা বানানোর
> আরক্ত কত তীক্ষ্ণ লজ্জা
> দৃষ্টিতে পুষে হাঁটি মানুষের ধূসর..."[১৩]

কবি এখানে সমস্ত মনুষ্য প্রাণীর আঁতের কথা টেনে বার করে এনেছেন। এই পর্যায়ে কবির অভিপ্রেত শিশিরের জলে কোন ধূসরতা নেই, আছে শুধু জীবনের চকচকে রং। এর পরেই কবিকল্পনায় রাতের সঙ্গে মিশিয়ে দেন এক পেট ক্ষুধার রাতকে—

> "কোন একদিন গারো উল্লাসে ছিঁড়ে যাবে টুঁটি
> হয়তো হিংস্র নেকড়ের পাল, তবু তুলে দিয়ে দরজার খিল ..."[১৪]

কবি অনুভব করেছেন চাঁদের জ্যোৎস্না ক্ষরিত রাত, যা সবার মনে প্রেম জাগায় না, কারো কারো মনে জাগিয়ে তোলে উল্লাস। আমরা মানুষ তাই শান্ত থেকে দরজায় খিল আঁটি, যে খিল প্রতিরোধ করে ভেতরের হিংস্রতাকে। মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে প্রেম, প্রীতিবোধকে। তাই কবি বলেছেন-

> "হয়তো কখনো আমার ঠান্ডা মৃতদেহ ফের খুঁজে পাবে কেউ
> শহরের কোন নর্দমাতেই; সেখানে নোংরা পিছল জলের
> অগুণিত ঢেউ খাবে কিছুকাল।"[১৫]

আসলে মৃতদের ডোবানো যায় নর্দমা অর্থাৎ পচা জায়গায়, তাই কবি মনে করেছেন তার মৃতদেহটি হয়তো কোন একদিন শীতল হয়ে পড়বে। শহরের গ্লানিভরা নর্দমার পচা জলে, যেখানে মানবিক অনুভূতি নেই, তবুও কবি রুপালি স্নান করতে চেয়েছেন। আসলে রুপালি স্নান এখানে শুদ্ধতার প্রতীক। তাই কবিতাটির নাম এখানে ব্যঞ্জনময় হয়ে উঠেছে কবির আপন দক্ষতায়।

শামসুর রহমানের 'রৌদ্র করোটি'তে(১৯৬৩) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আত্মহত্যার আগে' কবিতাটিতে কবি চিত্তের এক গহন ভাবের প্রকাশ হয়েছে। আলোচ্য কবিতায় কবি তাঁর ব্যক্তি প্রেমের ভাবের সঙ্গে নৈসর্গ চেতনা, যুগ-যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন। শামসুর রহমানের উল্লিখিত কবিতার বয়ান রয়েছে তার সমাজ চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তঃশীলা রূপ-

> "শয্যাত্যাগ, প্রাতরাশ, বাস, ছ' ঘন্টার কাজ, আড্ডা,
> খাদ্য, প্রেম, ঘুম, জাগরণ; সোমবার এবং মঙ্গলবার
> বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি আবার রবিবার একই বৃত্তে আবর্তিত..."[১৬]

আলোচ্য কবিতাটির প্রথম পংক্তিতে কবি বর্ণনা করেছেন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আভ্যাসকে। লক্ষ্যনীয় যে প্রতিদিন ঘুম, ঘুম থেকে ওঠা, খাওয়া, পড়া, কাজ, প্রেম, আড্ডা, সোমবার থেকে শনি, রবি একই বৃত্তে আবর্তিত আবহমান জীবন। অভ্যাসের গ্লানিতে মস্ত আকাশটিকেও কবির ইঁদুরের একটা ছোট্ট গর্ত বলে মনে হয়। প্রতিনিয়ত ভয়ে ভয়ে প্রতীক্ষা করেন কবিও, আগামীকালের আশা করেন। ত্রিশ উত্তীর্ণ কবি সহসা আয়নায় নিজের প্রতিকৃতি দেখে নিজের অস্তিত্বকে মুড়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 110 - 119
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ফেলতে চান খবরের কাগজে আবার অপরদিকে মাঝে মাঝে নিজের অস্তিত্বকে বোঝবার জন্য নড়েচড়ে বসেন অস্তিত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টায়। তাই কবি কিছু সস্তার বিজ্ঞাপনে চোখ রাখেন যৌবন ধরে রাখতে -

> "চায়ের চামচের দু'চামচ এবং খাবার আগে
> কিংবা পরে তাহ'লে বাড়বে ক্ষিদে আর স্নায়ুগুলি
> নিশ্চিত সবল হবে, যদি খান সুস্বাদু টনিক।"[১৭]

উল্লিখিত কবিতাটির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্তবক জুড়ে শুধুই অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার পরিসর চিহ্নিত। যেখানে কবিতায় নাটকীয় ভঙ্গীর একটা চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করাযায়। এরপর ঘটনা প্রবাহের উজান বেয়ে আসে জীবনকে টিকিয়ে রাখার যতরকম প্রয়াস-

> "নিজের বাড়ি, সাজানো বাগান, ধরা যাক,
> গাজরের খেত, মুর্গি ইত্যাদি স্বচ্ছন্দ্য বিন্যাসে
> মানবজীবন ধন্য, শৈশবের সাধের কল্পনা
> নক্সা অনুসারে, ধরা যাক, একে একে ঘটলো সবি।"[১৮]

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আট বছর আগের একদিন; কবিতাটি সেখানে প্রথম পুরুষীয় সর্বনামে চিহ্নিত মানুষটির শেষ পরিণতি ছিল আত্মহত্যা। কোন এক ফাল্গুনের পঞ্চমী তিথিতে চাঁদ ডুবে গেল সে এসেছিল একগাছা দড়ি হাতে অশ্বথের তলে। তবে আত্মহত্যার জন্য কোন কারণ আপাতত পক্ষে ছিল না। তবুও ব্যক্তিটির পক্ষে বেঁচে থাকা অসহ্য মনে হয়েছিল-

> "জীবনের এই স্বাদ সুপক্ক যবের ঘ্রান হেমন্তের
> বিকেলে তোমার অসহ্য বোধ হলো।"[১৯]

শামসুর রহমানের কবিতায়ও ভেসে আসে সেই চেনা স্বর। কবির প্রতীকি অনুভব করেছে অর্থ, কীর্তি, নাম, যশ, প্রেম, শিশু সবই তিনি পেয়েছেন। মানব জীবনে সুখী হতে যা কিছু প্রয়োজন সবই কবি পেয়েছেন। আসলে মানুষের জীবনে এইগুলি সত্য নয়, দৈনন্দিন চাওয়া পাওয়ার বাইরেও মানুষকে যুগের যন্ত্রণা ক্লান্ত করে দেয়। ইতিপূর্বে **১৯৩৬** সালে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যে 'বোধ' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন-

> "স্বপ্ন নয়-শান্তি নয়-ভালোবাসা নয়
> হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়।"[২০]

কবি যে সময় কবিতা লিখেছেন তখন উত্তপ্ত সময়, ছয়ের দশকে চারিদিকে যুদ্ধের পরিস্থিতি, অত্যাচার, ধর্ষণ, রক্তাক্ত ভূমিতে ফুলের আভা রক্তের মতই ঠিকরে বেরোয়, প্রেম নেই সেখানে-

> "জ্যোৎস্নার বিস্ময়ে ফেটে মহিলার অন্ধকার ঘরে।
> নিয়ন আলোর মত কারোর হাসি শতকণা।
> জাগায় স্মৃতির শব, হাড়হিম দেহে লাগে তাপ।"[২১]

ফলে কবির আত্মসত্ত্বা এক গভীর ক্লান্তি অনুভব করে। যুগের ব্যর্থতা থেকে অস্তিত্ব সঙ্গতি ও অসঙ্গতির মাঝে ঘুরপাক খায় কবিড় আমিত্ব। কবিতায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিপন্নতা বোধ, বিষন্নতা কাজ করবার পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে কবির ব্যক্তি জীবনের বিষাদময়তা যা কবির মানস ভাবনাকে তাড়িত করেছে। যার জন্যই তাঁর এমন অভিব্যক্তি, এমন মৃত্যু চেতনা। তাই কবি ঈশ্বরের ওপরে বিশ্বাস রাখতে পারেননি। অন্তিমে কবিকণ্ঠ বলে উঠেছে -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 110 - 119
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"যদি বলি প্রবঞ্চনা ঈশ্বরের অন্য নাম তবে
সত্য থেকে সঠিক ক'গজ দূরে আমার সংশয়ী পদক্ষেপ?"[২২]

সমকালের যে চোরাবালু তাকে অস্বীকার করতে পারে না কোন কবি, তাই সমকালের জখম জীবন, রোদের তাপ, বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে করে হাজির হয় কবির সৃজন বিশ্বে। বলাবাহুল্য শামসুর রহমানের কবিতা বিশ্বের ছায়া ফেলেছে তার সমকাল স্বদেশ সময় ও তার নিজের যাপন। 'নিজ বাসভূমি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি বাংলাদেশের সমসাময়িক জ্বলন্ত সময়কে চিহ্নিত করে-

"আমি মেঘনার মাঝি, ঝড় বাদলের, নিত্য সহচর
আমি চটকলের শ্রমিক, আমি মৃত রমাকান্ত কামারের নয়ন পুত্তলি,
আমি মাটি লেপা উঠোনের উদাস কুমোর, প্রায় খ্যাপা, গ্রাম উজানের সাক্ষী
আমি তাঁতী সঙ্গীহীন, কখনো পড়িনি ফার্সি, বুনেছি কাপড় মোটা
মিহি মিশিয়ে মৈত্রীর ধ্যান তাঁতে।"[২৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঊনসত্তর এর গণআন্দোলনের তীব্র জোয়ার এই কবিতায় সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন কবি। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচার যখন চরমে, তখন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষ গর্জে ওঠেন। সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে এই আন্দোলনে ঢেউ তোলে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ, যেমন কবিতায় উল্লেখিত হাদ্দিসার ক্লান্ত ফতুর কৃষক, মেঘনার মাঝি, চটকলের শ্রমিক, কুমোর, তাঁতি, কেরানি, ছাত্র, শিক্ষক নির্বিশেষে এই আন্দলনে শামিল হয়েছিল। জীবনের অর্থ বোঝাতে কবি তাঁর কবিতায় জীবনকে নানা পরিসরে তুলে ধরেছেন -

"জীবন মানেই পৌষের শীতার্ত রাতে আগুন পোহানো নিরিবিলি।
জীবন মানেই মুখ থেকে কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা একা শিস দিয়ে
জীবন মানেই টেপির মায়ের জন্যে হাট থেকে ডুরে শাড়ি কেনা
জীবন মানেই বইয়ের পাতায় মগ্ন হওয়া, সহপাঠিনীর চুলে
অন্তরঙ্গ আলো তরঙ্গের খেলা দেখা।"[২৪]

একাত্তরের পটভূমি কেড়ে নিয়েছিল বহু নিরপরাধ প্রাণকে, কেড়ে নিয়েছিল মায়ের কোল থেকে তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলেটিকে-

"বরকত বুক পাতে ঘাতকের খাবার সম্মুখে। সালামের বুক আজ উন্মথিত মেঘনা,
সালামের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা, সালামের মুখ আজ তরুন শ্যামল পূর্ব বাংলায়।"[২৫]

তাই শহরের পথে নিবিড় কৃষ্ণচূড়াকে দেখে মনে হয় শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদবুদ যা স্মৃতির গন্ধে ভরা, আবার এই কৃষ্ণচূড়ার রঙ আমাদের গণচেতনার রঙ, আবার এই রঙই আমাদের গণচেতনার রঙ। এই কবিতার প্রতিটি অক্ষরে ধরা পড়েছে কবির হৃদপিন্ডের ওঠানামা, তাকে গ্রাস করেছে বাস্তবতা। কবিতাটির অভ্যন্তরে বয়ে গিয়েছে যুগের স্লোগানের স্রোত, যা যে কোন মুহূর্তে কলরিত হয়ে উঠতে পারে। তাই বলা যায় কবির অবারিত স্মৃতিতে মোরা 'ফেব্রুয়ারির ১৯৬৯' কবিতাটি।

বাংলাদেশের স্বপ্নের রূপ আমরা দেখেছি জীবনানন্দের রূপসী বাংলায়। এর কয়েক দশক পরে রূপ শূন্য পীড়িতকালে বিক্ষুব্ধ বাংলার বাস্তব রূপকে তুলে ধরলেন শামসুর রহমান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঠিক প্রাকমুহূর্তে ১৯৬৯ এর গণজাগরণের যে রাজনৈতিক তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল তার বিক্ষোভজনিত ফল 'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়?' কবিতাটিতে-

"এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়? তেমন যোগ্য সমাধি কই?

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 110 - 119
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> মৃত্তিকা বলো, পর্বত বলো, অথবা সুনীল সাগর- জল সবকিছুই ছ্যাদা, তুচ্ছ শুধুই।
> তাইতো রাখি না এ লাশ আজ মাটিতে, পাহাড়ে কিংবা সাগরে
> হৃদয় দিয়েছি ঠাঁই।"[২৬]

এই আপাত সংক্ষিপ্ত কবিতাটিতে বিক্ষুব্ধ বন্দি বাংলার যে প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছিল। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় শহীদ হয়েছিল বহু তরুন প্রাণ, এই তরুন প্রাণদের মধ্যে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান, আব্দুল বরকত প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধে যাদের প্রাণ কৃষ্ণচূড়ার ফুলের মত ঝরে গিয়েছিল, সেই সমস্ত লাশ কফিনে বন্দী হওয়ার উপযুক্ত জায়গা ছিল না। তাদের আজও আমরা আমাদের হৃদয়ের মনের মনিকোঠায় রেখেছি। সর্বোপরি বলা যায় বর্তমান পরিসরে বাংলা ভাষাকে কিছুটা অবজ্ঞা সুরে দেখা হলেও এই ভাষার জন্য একদিন কত তরুণ প্রাণ দিয়েছিল, প্রাণ দিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হতে তাই এই শহীদদের লাশ হয়তো আপাতত কফিন বন্দি হলেও তার স্থান একমাত্র মানব হৃদয়ে।

সাহিত্যের বীজ সবসময়ই গ্রথিত থাকে সমাজের মাটিতে। সেই মাটিতে কুঠারাঘাত করে সাহিত্যিকরা, সেই মাটির গর্ভস্থল থেকে তুলে নিয়ে আসেন তাদের সাহিত্যের মূল মন্ত্রকে। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের যে সমস্ত সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্য বাংলাদেশের সমসাময়িক যুদ্ধযন্ত্রণাকে প্রতিবাদের পরিসরে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম পল্লীকবি জসীমউদ্দীন, কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। পাঁচ থেকে আটের দশকে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহ স্মৃতি প্রকাশিত হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম' (১৯৮৮ প্রথম খন্ড ও ১৯৮৯ দ্বিতীয় খন্ড) উপন্যাসে। এই উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। পাকিস্তানের হালদার বাহিনী, বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রদের কিভাবে অত্যাচার করেছে তার নির্মাণ চিত্র পাওয়া যায় এই উপন্যাসে—

> "আর্মি একটু পরেই ঢুকে পড়লো হলের মধ্যে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে গুলি করে মারছে। ছেলেদের শুধু ছাত্র হওয়াই অপরাধ। যারা জীবনে কখনো রাজনীতি করেনি তারা হাউমাউ করে কাঁদছে, কেউ কেউ ভাঙ্গা উর্দুতে দয়া ভিক্ষা করছে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোন কথা নেই। শুধু গুলি, শুধু গুলি।"[২৮]

এভাবেই সমসাময়িক কথাকার, কবি, সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্যে তুলে ধরেছেন যুগের সবচেয়ে কালো সময়কে। আজকের এই স্বাধীনতা একদিনে আসেনি, বহু রক্তিমতার নিশানা রয়েছে সেকালের ক্যানভাসে যার দাগ আজও স্পষ্ট। আমাদের আজকের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার স্বচ্ছতা, সাবলীলতার পিছনের কারণ তা আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন। সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনেই শামসুর রহমানের কবিতা যে যুগ চেতনার বার্তাবাহক তা পাঠক মনকে আকর্ষণ করতে সত্যি সিদ্ধহস্ত। শামসুর রহমানের কবি প্রতিভার মূল্যায়নে যুগের স্লোগানের স্রোত, স্বৈরাচারী শাসকের অত্যাচার, অনাচার, শোষণ, নাগরিক ক্লান্তি স্থান পেয়েছে। সুতরাং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই তিনি দুই বাংলার তথা বিশ্ব দরবারে অমর হয়ে থাকবেন।

Reference:

১. হাসান, মোরশেদ শফিউল, 'মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধ', ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ২২
২. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, 'চিলেকোঠার সেপাই', কলকাতা, প্রতিভাস, পঞ্চম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৭৬
৩. ইউসুফ, নাসির উদ্দিন (সম্পাদনা), 'একাত্তরের চিঠি' (আগস্ট ২০২২), ঢাকা, প্রথমা প্রকাশণ, ৫০ তম মুদ্রণ, পৃ. ১৬
৪. ঐ, পৃ. ৩৪
৫. দে, সুধাংশুশেখর (প্রকাশক), 'শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০২০,

পৃ. ১৪৩
৬. ঐ, পৃ. ১৪৩
৭. ঐ, পৃ. ১৪৩
৮. ঐ, পৃ. ১৪৪
৯. ঐ, পৃ. ১৪৪
১০. ভট্টাচার্য, প্রশান্ত (প্রকাশক), ‘ছাড়পত্র’, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫৪, পৃ. ৬২
১১. দে, সুধাংশুশেখর (প্রকাশক), ‘শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০২০, পৃ. ১৯
১২. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পাদিত), ‘জীবনানন্দ দাশের কাব্য সমগ্র’, কলকাতা ৭৩, ভারবি, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭, পৃ. ১৫১
১৩. দে, সুধাংশুশেখর (প্রকাশক), ‘শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, কলকাতা, এপ্রিল ২০২০, পৃ. ১৯
১৪. ঐ, পৃ. ২০
১৫. ঐ, পৃ. ২০
১৬. ঐ, পৃ. ৩৯
১৭. ঐ, পৃ. ৩৯
১৮. ঐ, পৃ. ৪০
১৯. বসু, শ্রী সৌরেন্দ্রনাথ (প্রকাশক), ‘জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, কলকাতা, নাভানা, প্রথম মুদ্রণ মে ১৯৫৪, পৃ. ৭৬
২০. ঐ, পৃ. ১৯
২১. দে, সুধাংশুশেখর (প্রকাশক), ‘শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০২০, পৃ. ৪০
২২. ঐ, পৃ. ৪১
২৩. ঐ, পৃ. ৭৩
২৪. ঐ, পৃ. ৭৪
২৫. ঐ, পৃ. ৭৬
২৬. ঐ, পৃ. ৮২
২৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘পূর্ব পশ্চিম’ (দ্বিতীয় খন্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ৫৬০

Bibliography:

চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার, ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’ (২০২২), কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ
কামাল, বেগম আকতার, ‘শামসুর রহমানের কবিতা অভিজ্ঞান ও সংবেদ’, ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
আজাদ, হুমায়ুন, ‘শামসুর রহমান/ নিঃসঙ্গশেরপা’, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ২০০৪